গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১৪ নভেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

আর জি কর হাসপাতালের ইন্টার্নিদের ওপর থেকে অন্যায় সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে ৭ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এস ও'র বিক্ষোভ। এদিন সহ-উপাচার্যকে এই দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

আর জি করের ঘটনায়

রাইখস্ট্যাগের ছায়া

আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রকৃত কোন তদন্ত ছাড়াই সরকারি নির্দেশে দুজন হাউসস্টাফকে বরখাস্ত এবং চারজন ইন্টার্নিকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এমনকি যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী তা-ও সাসপেনসন অর্ডারে উল্লেখ করা হয়নি। শাস্তি দেওয়ার আগে অভিযুক্তদের বক্তব্য শোনার প্রচলিত বিচারের নীতিকেও মানা হয়নি, তাঁদের কোন বক্তব্য শোনা হয়নি। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, সরকার চূড়ান্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই এ কাজ করেছে।

ইন্টার্নিরা রাজ্য সরকারের কর্মচারী নন, তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কাজেই তাঁদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। একথা জানার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর শাস্তির ভার ছেড়ে না দিয়ে এবং রাজ্য-জোড়া প্রতিবাদ, জুনিয়ার ডাক্তারদের আউটডোর বয়কট, মেডিক্যাল ছাত্রদের ধর্মঘট সবকিছু উপেক্ষা করে, স্বাস্থ্যদপ্তরের অধিকারের সীমা না মেনে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বৈরাচারী জেদের সঙ্গে শাস্তি ঘোষণা করেছেন। এই স্বৈরাচারী শাস্তি ঘোষণার প্রতিবাদে ৭ নভেম্বর আর জি করে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন-অবস্থানও সরকারি নির্দেশে পুলিশ লাঠি চালিয়ে ভেঙে দিয়েছে।

আইনের শাসন না অলিখিত টাডা

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন — "দেশের আইন মেনেই সবাইকে চলতে হবে। অভিযুক্তদের শাস্তি পেতেই হবে" (প্রতিদিন ৬.১১.০৩)। ওই দিন গণশক্তির রিপোর্টেও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে — 'আইন তার নিজের পথেই চলবে।' যেন এই সরকার আইনের শাসন মেনেই চলছে। আইনের শাসন মেনেই তাদের রাজত্বে শত শত তারকেশ্বর লোহার, দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বুল্টন ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। একথা সকলেই অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, শাসক সি পি এমের আশ্রয়ে থাকলে খুনিও গ্রেপ্তার হয়না। কিন্তু বিরোধীদের বিনা অপরাধে সাজা

দুয়ের পাতায় দেখুন

জুনিয়ার ডাক্তারদের সাসপেনশনের ফতোয়া প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ নভেম্বর এ আই ডি এস ও'র আহ্বানে রাজ্যব্যাপী সফল ছাত্রধর্মঘটের খবর ৮ পাতায়

মিটিং-মিছিল

সরকারি প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল এস ইউ সি আই

(*এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ নভেম্বর, ২০০৩ মুখ্যমন্ত্রীকে নিম্নলিখিত চিঠি দিয়েছেন*। একই দিনে সাংবাদিক সম্মেলনে চিঠির প্রতিলিপি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া হয়।)

মিছিল ও সমাবেশ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি আপনার সরকারের মুখ্যসচিব আমাদের দলের কাছে পাঠিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন যাতে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের অভিমত জানাই। প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবের বয়ান অনুযায়ী এতদিন মিটিং-মিছিলের যতটুকু সুযোগ ছিল, তাকেও খর্ব করা হয়েছে।

আপনি জানেন, জনগণের মিটিং-মিছিল-প্রতিবাদ-আন্দোলন সংগঠিত করার অবাধ সুযোগ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অন্যতম অলঙ্ঘনীয় অধিকার হিসাবেই একদিন অর্জিত হয়েছিল। ক্ষমতাসীন শ্রেণী, রাষ্ট্র ও সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধে এই রক্ষাকবচ এসেছিল। যদিও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম স্তরে এই অধিকারগুলি যত সজীব ও ব্যাপক ছিল, পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এই অধিকারগুলি 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের' নামে অনেকাংশেই সঙ্কুচিত, খর্বিত ও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজও যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দেশ সম্প্রতি ইরাক ও আফগানিস্থানে সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র পদদলিত করে ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড চালিয়েছে, সেই দেশে ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশে লক্ষ লক্ষ জনগণ মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট করছে। সেখানকার সরকার আজও এ রকম স্বৈরাচারী বিধিনিষেধ আনেনি, অথচ আপনারা আনতে চলেছেন কেন? নিশ্চয়ই একথা বলতে পারেন না যে, এইসব দেশের শহরে পথচারী থাকেনা এবং গাড়ির সংখ্যা অনেক কম।

ব্রিটিশ শাসনের যুগেও এই কলকাতা শহরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সহ অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বে সংগঠিত বহু বিশাল মিটিং-মিছিল-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। শাসকেরা সেগুলিকেও পর্যুদস্ত করার জন্য লাঠি-গুলিও চালিয়েছে, কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি, অথচ আপনারা নিচ্ছেন। সেদিনও শহরের রাস্তায় পথচারী এবং গাড়ির যাতায়াত

চারের পাতায় দেখুন

সাংবাদিকদের কারাবাসের নির্দেশের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কমিটি

'বিধানসভার স্বাধিকার ভঙ্গ করা'র অভিযোগে 'দি হিন্দু' ও অন্যকিছু সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের কারাবাসের যে-নির্দেশ তামিলনাড়ু বিধানসভা দিয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৮ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বুর্জোয়া শাসকদের মধ্যে যেভাবে অসহিষ্ণুতা ও স্বৈরাচারী ঝোঁক ক্রমাগত বাড়ছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। তিনি দৃঢ়তার সাথে আরও বলেন যে, এই নির্দেশের দ্বারা অবশ্যই গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ হানা হয়েছে, এবং মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার, যা গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালনায় অপরিহার্য, সেই অধিকারেও নগ্ন হস্তক্ষেপ ঘটানো হয়েছে।

কমরেড মুখার্জী এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার আবশ্যিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে, দেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণের কাছে এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আবেদন জানিয়েছেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে

জনসভা

১৭ নভেম্বর বিকাল ৫টা মহাজাতি সদন, কলকাতা

***প্রধান বক্তা ঃ* কমরেড নীহার মুখার্জী**

বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখবেন

তদন্ত ছাড়াই শাস্তির হুকুম হয়ে গেল

একের পাতার পর

হয়ে যায়। হাউসস্টাফ ও ইন্টার্নিদের যেভাবে তাঁরা তদন্ত ছাড়াই, বিনা প্রমাণে সরকারি হুকুমবলে শাস্তি দিয়েছেন — দেশের কোন্ আইনে তা দেওয়া যায় তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীই জানেন! একমাত্র টাডা বা পোটার মতো ফ্যাসিস্ট আইনে সরকার ইচ্ছামত বানানো অভিযোগে বিনাবিচারে জেলে ভরতে পারে। কারণ এইসব কালাকানুনে অভিযোগ প্রমাণের দায় অভিযোগকারীর থাকে না; অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হয় সে নির্দোষ। স্বাস্থ্যমন্ত্রীও ঠিক এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন — অভিযুক্তদেরই প্রমাণ করতে হবে যে তাঁরা নির্দোষ। তাঁর এই ফতোয়াকে অলিখিত টাডা প্রয়োগ ছাড়া কী বলা যায়?

দীর্ঘদিনের সুপরিকল্পিত সরকারি অবহেলায় হাসপাতালের শোচনীয় অবস্থার ভয়াবহ চেহারা সম্প্রতি একের পর এক বেরিয়ে এসেছে।

৬ নভেম্বর আর জি কর হাসপাতালের গেটে জুনিয়ার ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্রদের বিক্ষোভ

প্রতিদিন বহু মানুষ প্রায় বিনা চিকিৎসায়, অবহেলায় মারা যাচ্ছে। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার, বিন্দুমাত্র দায়িত্বশীল হলে এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ন্যূনতম দায়বোধ থাকলে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অগ্রাধিকার দিয়ে হাসপাতালগুলির হাল ফেরাবার চেষ্টা করত। তা তারা করেনি। বরং হাসপাতালের অব্যবস্থা ও অবহেলাজনিত মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর যত প্রকাশ্যে আসতে থাকে, ততই সংবাদমাধ্যমগুলির বিরুদ্ধে এবং যারা হাসপাতালের বেহাল অবস্থা ফেরানোর দাবিতে আন্দোলন করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকারের আক্রোশ বাড়তে থাকে। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে এতটাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়ে যে, শেষপর্যন্ত একটা ঘটনাকে ব্যবহার করে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যারা সরকারি স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধতা করছিল তাদের মধ্যে ছজন নিরপরাধ জুনিয়ার ডাক্তারকে শাস্তি দেয় এবং প্রচণ্ড তৎপরতায় অভূতপূর্ব পুলিশি ব্যবস্থা করে হাসপাতালে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। এ থেকেই তাদের জনবিরোধী চরিত্র সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে।

সি পি এমের চক্রান্তের স্বরূপ

কতদূর নীচে নামতে পারলে নিজেরাই পরিকল্পিতভাবে ঘটনা ঘটিয়ে তার দায় বিরোধী দলের ছয় জন নিরপরাধ জুনিয়ার ডাক্তারের ওপর চাপিয়ে (যাদের মধ্যে আমাদের দলের ছাত্রসংগঠনের সাথেই যুক্ত তিন জন) তাদের বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ ঘটনা রাইখস্টাগে আগুন লাগিয়ে পরিকল্পিতভাবে কমিউনিস্টদের ওপর তার দোষ চাপিয়ে নির্বিচারে কমিউনিস্ট নিধনের হিটলারি ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সিপিএম-এর এই চক্রান্ত দ্রুত মানুষ ধরে ফেলে। রাজ্যের মানুষ, চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ এবং সংবাদপত্র মহলের প্রায় সকলেই অতি দ্রুত বুঝতে পারে যে, আর জি কর হাসপাতালে তুলকালাম গণ্ডগোল ও সাংবাদিক নিগ্রহের প্রকৃত নায়ক সি পি এম এবং তাদের প্রভাবিত সংগঠনের নেতারা। এখন দেখা যাক, কী উদ্দেশ্যে এবং কীভাবে পরিকল্পিত উপায়ে তারা এই ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাল?

আর জি করের ঘটনাগুলি পর পর সাজালে খুব সহজেই বোঝা যায়, প্রথমত এর পিছনে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা কাজ করেছে। দ্বিতীয়ত, অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী সংগঠিত একটি শক্তি এর পিছনে কাজ না করলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা এবং সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সামনে সাংবাদিকদের পেটানো এবং পুলিশকে পেটানোও সম্ভব হত না। ১ নভেম্বর, শনিবার রাত ১১-১০ মিনিটে মেডিসিন বিভাগে একজন রোগীর মৃত্যু থেকে ঘটনার সূত্রপাত এবং ১১-৫০ মিনিট অর্থাৎ মোট চল্লিশ মিনিটের মধ্যে দ্রুত যেভাবে পর পর ঘটনা ঘটে যায় তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মৃতের ক্ষুব্ধ আত্মীয়স্বজনের সাথে চিকিৎসারত জুনিয়ার ডাক্তারের বচসা থেকে দ্রুত রটিয়ে দেওয়া হয় জুনিয়ার ডাক্তারটি রোগীর আত্মীয়দের হাতে প্রহৃত হয়েছেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ পরিকাঠামোহীন হাসপাতালে শয্যাসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি রোগী ভর্তি হওয়ায় চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। তার ওপর সম্প্রতি বেড না পেয়ে সুস্মিতা বিশ্বাসের মৃত্যুর খবর প্রকাশ হওয়ার পরও সব জেনেও পরিকাঠামো উন্নয়নের কিছুমাত্র ব্যবস্থা না করে সরকার ঢালাও ভর্তির নির্দেশ দেয়। ফলে এমনিতেই শোচনীয় অবস্থা আরও শোচনীয় আকার ধারণ করে। ঘরের মেঝে উপছে বারান্দা, লিফট, সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত রোগীতে ভরে যায় এবং চিকিৎসা বহুলাংশে প্রহসনে পর্যবসিত হয়। এর ফলে, বিশেষত জুনিয়ার ডাক্তাররা প্রবল কাজের চাপ এবং যেকোন মুহূর্তে মার খাওয়ার আশঙ্কা মাথায় নিয়েই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। সংবাদপত্রেও যেভাবে হাসপাতালের বেহাল অবস্থার সংবাদগুলি বের হচ্ছিল তাতে পরিকাঠামোর অভাব এবং শাসকদলের প্রশ্রয়ে পুষ্ট একদল ডাক্তারের অবহেলা ও কর্তব্যজ্ঞানহীনতা, টাউটচক্রের দুর্নীতি ও তাদের হাতে রোগীর আত্মীয়দের হয়রানি — সবকিছুর দায় এবং রোগীর আত্মীয়দের ক্ষোভ সমস্ত কিছু এসে পড়ছিল কর্তব্যরত ডাক্তারদের উপর। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার একটা বড় দায়িত্ব যেহেতু জুনিয়ার ডাক্তাররাই পালন করেন এবং রোগীর আত্মীয়রা তাঁদেরই হাতের কাছে পান, তাই দায়িত্বশীল যাঁরা তাঁরাই বার বার রোগীর আত্মীয়দের রোষের মুখে পড়ছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল।

শুরুতে, হাসপাতালে মৃত্যুর কারণ হিসাবে সংবাদপত্র যখন মিটিং-মিছিলের দিকে আঙুল তোলে, তখন শাসক দল সি পি এম খুশিই হয়েছিল। কারণ তারাও চাইছিল মিটিং-মিছিলের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ চালু করতে। ফলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হাসপাতালে মৃত্যুসংবাদ মিটিং-মিছিলের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ চালু করার অনুকূলে জনমত টেনে আনছিল বলে সি পি এম নেতৃত্বও তা কাজে লাগাচ্ছিল এবং এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ও প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু করে হাসপাতালের শোচনীয় সরকারী অব্যবস্থার যতটুকু খবর বের হচ্ছিল তা চাপা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে সরকার মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরই হাসপাতালের অব্যবস্থা, চূড়ান্ত দলবাজি, অবহেলা ইত্যাদি বিষয়গুলি পরপর কতগুলো মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার সামনে চলে আসে। সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভও তীব্র আকার ধারণ করে। এর পরই সরকার বলতে শুরু করে হাসপাতাল নিয়ে সংবাদমাধ্যম অপপ্রচার চালাচ্ছে।

'রাজনৈতিক মোকাবিলা'র আসল চেহারা

শনিবার ১ নভেম্বর গণশক্তিতে প্রকাশ, অনিল বিশ্বাস বলেছেন — "দু-একটি দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে।" তিনি আরও বলেন "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে.....বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চক্রান্তকে সি পি আই(এম) রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবে।" দীর্ঘদিন থেকেই সি পি আই(এম) নেতাদের 'রাজনৈতিক মোকাবিলা'র স্বরূপ এ রাজ্যের মানুষ ভাল করেই জানেন। এর অর্থ হল, দলীয় মস্তানবাহিনী এবং সমাজবিরোধী ও পুলিশ দিয়ে প্রতিবাদের কণ্ঠ দমন করা। '৮৩ সালে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের উপর পুলিশের সাথে ক্যাডারবাহিনী ও সমাজবিরোধী লেলিয়ে বর্বর অত্যাচার তাঁদের 'রাজনৈতিক মোকাবিলা'র মুখোস খুলে দিয়েছিল। এরপর '৮৩-র ও '৮৭-র জুনিয়ার ডাক্তারদের রাজ্যব্যাপী শক্তিশালী আন্দোলনকেও এভাবেই তাঁরা 'রাজনৈতিক মোকাবিলা' করেছিলেন। পরবর্তী ২০ বছরে সরকারবিরোধী আন্দোলনকে গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে 'রাজনৈতিক মোকাবিলা' তাঁরা বার বার করেছেন। সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের বিবৃতি প্রকাশের দিনই রাত্রে আর জি করে তুলকালাম ঘটনায় বোঝা যায় 'রাজনৈতিক মোকাবিলার' ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে আগেই তাঁরা তৈরি রেখেছিলেন। রাত ১১-১০ মিনিটে একজন রোগীর মৃত্যু এবং তাকে উপলক্ষ করে রোগীর আত্মীয়স্বজনের সাথে কর্তব্যরত জুনিয়ার ডাক্তারের বচসার ঘটনাকে জুনিয়ার ডাক্তারের উপর রোগীর আত্মীয়দের আক্রমণের প্রচার অতি দ্রুত মুখে মুখে ছড়িয়ে এবং জুনিয়ার ডাক্তারদের হোস্টেলে বিপদ ঘণ্টা বাজিয়ে সি পি এম বাহিনী জুনিয়ার ডাক্তারদের যেভাবে দ্রুত ডেকে এনে জড়ো করে, তাতে এ ধরনের পরিকল্পনা যে আগেই ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। তারা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনিতেই ক্ষুব্ধ জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রবলভাবে উত্তেজিত করে। সেই উত্তেজনার মধ্যে সি পি এম সমর্থিত কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এস এফ আই, জুনিয়ার ডাক্তার কাউন্সিলের নেতারাও কাজে নেমে পড়ে। পরিকল্পিতভাবেই ফোন করে প্রেসকেও তারা ডাকে। প্রেস জড়ো হওয়ার সাথে সাথে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে — আলোকচিত্রীদের পেটায়, ক্যামেরা ভেঙে দেয়।

৪ নভেম্বর নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকা, 'এস এফ আই আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিল' — এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। তাতে তারা বলে, সি পি এম অনুগত হাউসস্টাফদের সেল-ফোনে খবর দিয়ে জড়ো করা হয় এবং ওয়ার্ড বয়, লিফ্‌ট ম্যানদের নির্দেশ দিয়ে লিফট ও গেট বন্ধ করানো হয়। রাত সাড়ে এগারোটায় তাণ্ডব শুরু হয়। হিন্দুস্তান টাইমস আরও জানিয়েছে, আর জি করে ৭৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৫৮৫ জন এস এফ আই-এর সদস্য, ডি এস ও'র সদস্য ৩০ জন; ২৫০ জন জুনিয়ার ডাক্তারের মধ্যে ২০০ জন সি পি এম প্রভাবিত জুনিয়ার ডাক্তার কাউন্সিলের সদস্য। এই অবস্থায় মুষ্টিমেয় বিরোধীরা কী করে এতবড় কাণ্ড ঘটাল? এ প্রশ্নের সদুত্তর

তিনের পাতায় দেখুন

মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের প্রতিবাদ

মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার-এর রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা গত ৪ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন — "গত শনিবার রাত্রে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে কোনরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই, সমস্তরকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে, অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সরকার একতরফাভাবে যে শাস্তি ঘোষণা করল তা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি।"

ডাঃ বেরা আরও বলেন, সেদিন মধ্যরাত্রে সাংবাদিকদের ওপর হামলায় জড়িত কলেজের এস এফ আই, শাসকদলের সমর্থক জুনিয়র ডাক্তার ও স্থানীয় শাসকদলের নেতৃত্বে হামলাকারী সমাজবিরোধীদের আড়াল করতেই সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের এই হীন প্রচেষ্টা। ডাঃ বেরা দাবি করেন —

১) অবিলম্বে দু'জন হাউসস্টাফের বরখাস্তের আদেশ ও চারজন ইন্টার্নির ওপর সাসপেনশনের সুপারিশ প্রত্যাহার করতে হবে,
২) ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দিতে হবে,
৩) হাসপাতালের পরিকাঠামোর যথাযথ উন্নতি ঘটিয়ে ডাক্তারদের কাজের পরিবেশ এবং রোগীদের পরিষেবার উন্নতি করতে হবে।

শাস্তির ভয় দেখিয়ে গণআন্দোলন দমানো যাবেনা

দুয়ের পাতার পর

এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক অপূর্ব ব্যানার্জী দিতে পারেন নি।

৪ নভেম্বর বর্তমান পত্রিকাও এই ঘটনায় আঙুল তুলেছে সি পি এমের দিকে। তারা সম্পাদকীয়তে লিখেছে — "আর জি কর হাসপাতালে সি পি এম-বিরোধীরা তাণ্ডব চালাবে, আর পুলিশ বা সি পি এম তা চলতে দেবে — এমন সম্ভব? আর জি করে ছ'বছর ধরে এস এফ আই জিতে আসছে, গত কয়েক বছর তো তারা 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা'য় জিতছে। হাসপাতালটির অবস্থান বেলগাছিয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে — যেখানে বুথ বিশেষে ১০০ শতাংশ ভোট পড়ে সি পি এমের পক্ষে। এমন একটি জায়গার এমন একটি হাসপাতালে বিরোধীরা এত বড় তাণ্ডব সহজে চালাতে পারে? তাদের হাতে মার খেয়েও পুলিশ অত সহজে ছেড়ে দেবে? শনিবার রাতে মাইক হাতে নিয়ে পুলিশ হাঙ্গামাকারীদের শান্ত হতে বলেছিল। তৃণমূল, বিশেষ করে, এস ইউ সি-র সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ সাম্প্রতিককালে কখনও এরকম ব্যবহার কি করেছে?"

সিপিএম কাউন্সিলর শাস্তিপ্রাপ্ত ডাক্তারদের নাম জড়িয়ে দিয়েছে

এর সাথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের দল তুলেছিল, তাহল আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত তিনজন ইন্টার্নি সহ ছয় জনের নাম কে দিল? আমরা বলেছিলাম — "স্থানীয় সি পি এম কাউন্সিলার এই নামগুলি দিয়েছেন। না হলে, বাইরে থেকে আসা মৃতের আত্মীয়স্বজন এঁদের নাম জানবেন কী করে? গণশক্তি'ই বলেছে, স্থানীয় সি পি এম কাউন্সিলারের সঙ্গে গিয়ে মৃতের আত্মীয়রা এফ আই আর করেছে। এতেই পরিষ্কার, সি পি এমের তরফ থেকেই নামগুলি দেওয়া হয়েছে।"

এই প্রশ্নে টাইমস অব ইণ্ডিয়া ৪ নভেম্বর লেখে — "গণ্ডগোলের মধ্যে কারা ছিল তাদের নাম মৃতের পরিবারবর্গ এত নিখুঁতভাবে বলেছে যাতে প্রবীণ পুলিশ অফিসাররা তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন। চিৎপুর থানার প্রবীণ পুলিশ অফিসার বলেন — শত শত লোকের মাঝখান থেকে এই ছাত্রদের যেভাবে মৃতের পরিবারবর্গ মনে রেখেছে তা যথেষ্ট বিস্ময়কর।" ওই পত্রিকাই বলছে, মৃতের "পরিবারবর্গ বলেছে স্থানীয় সি পি এম কাউন্সিলার দিলীপ ব্যানার্জীর নির্দেশেই তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায়।.....মৃতের পুত্র কাজল বণিক বলেন — অভিযোগ দায়ের করার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান নেই। ব্যানার্জীই আমাদের রবিবার সন্ধ্যায় ডায়রি করতে বলেন। নামগুলি দিয়ে তিনি আমাদের খুবই সাহায্য করেছেন।"

৫ই নভেম্বর স্টেটসম্যানের কলকাতা ক্রোড়পত্রের রিপোর্টে — মৃতের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন — যাদের রোগী মারা গেল, কোন্ ডাক্তার তাদের রোগীর চিকিৎসা করেছেন তার নাম তারা বলতে পারেনি। অথচ যাদের তারা কোনদিন চোখেই দেখেনি তেমন ডাক্তারদের টাইটেল সহ পুরো নাম দিয়ে, এরাই তাদের মেরেছে, বলে অভিযোগ করে দিল। এমনকি অভিযোগ সত্য কিনা, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরেও রোগীর আত্মীয়রা নীরব থেকেছে। এ থেকেই পরিষ্কার, উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত ইন্টার্নিদের নাম সি পি এম নেতৃত্বই পুলিশকে দেয়।

টিভি-র ছবি পরস্পরবিরোধী

টেলিভিশনে যে ছবি দেখানো হয়েছে তাতেও পরস্পরবিরোধিতা ও মিথ্যাচার খুবই পরিষ্কার। রবিবার ২ নভেম্বর সন্ধ্যায় খাস খবরে আর জি করের তাণ্ডবের ঘটনার অল্প পরে তোলা যে ছবি প্রথম দেখানো হয় তাতে বৃত্ত এঁকে স্পট করে করে যাদের অপরাধী বলে তারা চিহ্নিত করে, তাঁদের মধ্যে আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত যে তিনজন ইন্টার্নিকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে তাঁরা কেউই ছিলেন না। বরং পুলিশের রাইফেল কেড়ে ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ যাকে ধরে এবং পরদিনই তাকে ছেড়ে দেয়, তার ছবি ছিল। বৃত্ত দিয়ে স্পট করে পুলিশের গাড়ির মধ্যে তাকে দেখানোও হয়েছিল। পরদিনই এত সহজে কেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হল? এ প্রশ্নের সাফাই দিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন — রাইফেল ভাঙেনি, বল্টু নাকি খুলে গিয়েছিল। অথচ টি ভি'র ছবিতে ভাঙা রাইফেল স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পরে তার সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যও নেই এবং তার কোন শাস্তিও হয়নি কার নির্দেশে ?

অথচ অভিযোগ আনা হল যাদের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে আমাদের দলের তিন জনের কেউই তাণ্ডব চলাকালে ঘটনাস্থলে ছিল না। ঐদিনই হাজরা মোড় ও ধর্মতলায় আমাদের আন্দোলনের ওপর প্রচণ্ড পুলিশি আক্রমণে শতাধিক কমরেড আহত হয়। ১৭ জনের আঘাত ছিল গুরুতর। আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত ডাক্তাররা এদের চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিলেন। ইন্টার্নি শুভজিৎ রায় বেশ অসুস্থও ছিল। তাণ্ডব ঘটে যাওয়ার কিছু পর গোলমালের খবর পেয়ে হোস্টেল থেকে সে অনেক রাতে বেরিয়ে আসে এবং পুলিশী লাঠিচার্জে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত জুনিয়ার ডাক্তারদের শান্ত করার ও পুলিশি আক্রমণের প্রতিকার দাবি করার চেষ্টা করে। ইন্টার্নি বিপ্লব চন্দ ঘটনার সময় ছিল দূরে, মানিকতলা হস্টেলে। পুলিশি জুলুমের খবর পেয়ে মধ্যরাতে আর জি করে এসে সে প্রতিবাদ অবস্থানে যোগ দেয়। ইন্টার্নি শুভঙ্কর চ্যাটার্জী ছিল দিদির বাড়ি। পরদিন সকালে এসে সে অবস্থানে যোগ দেয়। আমাদের দলের ডাক্তার কর্মীদের চেষ্টাতেই পরদিন সংবাদপত্র ও টি ভি ক্যামেরাম্যানরা আর জি করে ঢুকতে পারেন ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ছবি তোলেন। রবিবার বিকালে সিপিএম কাউন্সিলার আমাদের কমরেডদের সহ ৬ জনের নামে পুলিশে ডায়রি করায়। তারপরই 'আকাশ' চ্যানেলের খবরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান থেকে তোলা আমাদের কমরেড ইন্টার্নি ও আর তিনজন নিরপরাধ চিকিৎসকের ছবিতে বৃত্ত করে স্পট করে মন্তব্য করা হয়, এরা 'অপরাধী'।

দু'দিনের ছবিই যাঁরা টিভিতে দেখেছেন, তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন — প্রথম দিনের খাস খবরের দেখানো ছবিতে অভিযুক্ত হাউসস্টাফ ও ইন্টার্নিরা ছিলনা। পরের দিন 'আকাশ' চ্যানেল পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থানের ছবি দেখিয়ে, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে অংশগ্রহণকারীদের 'অপরাধী' বলে চিহ্নিত করল কেন? কার স্বার্থে?

চক্রান্তের পিছনে সিপিএমের উদ্দেশ্য

যে কোন ঘটনার পিছনে স্বার্থ কার, মোটিভ কী, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই ঘটনা ঘটানোর পিছনে সি পি আই এমের তিনটি উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। তারা চায় প্রথমত, হাসপাতালে সাংবাদিকদের প্রবেশ বন্ধ করে হাসপাতালের বেহাল অবস্থার খবর বের হওয়া বন্ধ করতে। এজন্য পুলিশি কড়াকড়ি ও প্রাক্তন সৈনিক নিয়োগ করার পরিকল্পনা কার্যকর করতে। দ্বিতীয়ত, রোগীর আত্মীয় তথা জনগণের সঙ্গে ডাক্তারদের বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনকে দুর্বল করতে এবং হাসপাতালের প্রকৃত সমস্যা ও সরকারের অবহেলা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে। তৃতীয়ত, সরকারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে পরিণাম খারাপ হবে এই আতঙ্ক ডাক্তার সহ সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু শাস্তির ভয় দেখিয়ে গণআন্দোলন দমন করা যায় না।

ইদানীংকালে হাসপাতালে সরকারি অবহেলা, প্রশাসনিক দুর্নীতি ইত্যাদির খবর প্রায়শই সংবাদপত্রে খুব গুরুত্ব দিয়ে বের হচ্ছিল। এতে সিপিএম খুব বিপদে পড়ে যায়। ফলে তারা একদিকে একে মিথ্যাপ্রচার বলে ওড়াতে চেয়েছে, অন্যদিকে হামলা করে সাংবাদিক পিটিয়ে সুকৌশলে তার দায় চাপিয়ে দিয়েছে অন্যান্যদের সাথে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত তিনজন ইন্টার্নির উপর।

এই আর জি কর হাসপাতালে কিছুকাল আগে মেডিক্যাল ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাসের রহস্যজনক মৃত্যুকে যখন শাসকদল ও পুলিশ-প্রশাসন আত্মহত্যা বলে চালাতে চেয়েছিল তখন বাধা দিয়েছিল যারা, আমাদের কমরেড ইন্টার্নিরা ছিল তাদের সামনের সারিতে। তখন এও বেরিয়ে আসে যে, আর জি করের হোস্টেলে এস এফ আই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পর্ণোছবি দেখা সহ নানা অসামাজিক কাজ চলে, যার সঙ্গে বৃহৎ একটি স্বার্থান্বেষী চক্র যুক্ত। সৌমিত্র বিশ্বাসের ঘটনার প্রতিবাদ হওয়ায় ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ে। আমাদের দলের নেতৃত্বে যে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন চলছে তার চাপে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে নানা ক্ষেত্রে হাসপাতালের বর্ধিত চার্জ কিছুটা কমাতে বাধ্য হয়েছে, ডাক্তারি পড়ার মাসিক বেতন যতটা বাড়াতে চেয়েছিল ততটা পারেনি, লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি জমা নিয়েও তারা এবছর এম বি বি এসে ক্যাপিটেশন সীটে ছাত্র ভর্তি করতে পারেনি, এক বছর তা পিছিয়ে গিয়েছে। আর জি করেও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যনীতি এবং সি পি এম ও এস এফ আই-এর নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ক্ষেত্রে ডি এস ও'র ছাত্ররা বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। সি পি এম-এস এফ আই যেখানে নানা সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে ছাত্রদের নিজেদের কব্জায় রাখে তার বিপরীতে, আমাদের দলের কর্মীরা মেডিক্যাল এথিক্স, উন্নত চরিত্র, জনগণের প্রতি ভালোবাসা, রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতা ও গণআন্দোলনের চেতনায় মেডিক্যাল ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে, যা সি পি এমের দুষ্ট রাজনীতির পায়ের নিচের জমি কেড়ে নেয়।

যেদিন থেকে রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশ ও কেন্দ্রের নয়া আর্থিক নীতি অনুসরণ করে, হাসপাতালে ফ্রি-বেড তুলে দেওয়া, সমস্ত ক্ষেত্রে চার্জ বৃদ্ধি এবং ডাক্তার নার্স নিয়োগ বন্ধ করা শুরু করে — তখনই আমরা এর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলেছিলাম এবং প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছিলাম, যা আজও চলছে। আর জি করে এই আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা আমাদের দলের তিনজন এই কারণেই সরকারের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আরও তিনজন নিরপরাধকে। সকলেই জানেন, আমাদের দল, বিপ্লবী দল হিসাবে উন্নত নৈতিকতার আধারে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার অতি সামান্য যতটুকু আমাদের কর্মীরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন — তাতে এদেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা তাঁরা পান। এই কারণেই সিপিএমের এই চক্রান্তকে দেশের মানুষ অতি সহজেই ধরতে পেরেছেন এবং গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই মানুষ এর জবাব দেবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এস ও'র বিক্ষোভ ডেপুটেশন

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে সাংবাদিক নিগ্রহের মতো অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের আড়াল করে রাজ্য সরকার ছয়জন জুনিয়র ডাক্তারের যে শাস্তির আদেশ দিয়েছে, তার প্রতিবাদে গত ৬ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এস ও'র ডাকে ছাত্র বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য এই ডেপুটেশন গ্রহণ করেন।

দুই হাজার ছাত্রের এক সুসজ্জিত মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে এক বিক্ষোভ সভায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের দাবি এবং হাসপাতালে সাংবাদিকদের অবাধ প্রবেশাধিকারের দাবিতে দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় গেটে রাজ্য সরকারের সাসপেনশনের আদেশের কপি পোড়ানো হয়।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

মিটিং-মিছিল-প্রতিবাদ-আন্দোলন বন্ধ হলে শোষণ আরও বেপরোয়া হবে, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সমগ্র রাজ্যকে গ্রাস করবে

একের পাতার পর

ছিল, কিন্তু আজকের এই 'অসুবিধা'র প্রশ্ন তোলা হয়নি।

স্বাধীনতাপরবর্তীকালেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের প্রতিবাদে ও মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে বহু বৃহৎ মিটিং-মিছিল-আন্দোলন হয়েছে। বিশেষ করে '৫৩ সালের ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে, '৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনে, '৫৫ সালের গোয়ামুক্তি আন্দোলনে, '৫৬ সালের বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে, '৫৯ সালের ও '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে, '৬৭-৬৮ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া বিরোধী আন্দোলনে এই রাজ্যে দিনের পর দিন কত বিশাল বিশাল মিটিং-মিছিল হয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড ফাইট হয়েছে, সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। এমনকি সেদিন আতঙ্কিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু কলকাতাকে 'মিছিল নগরী', 'দুঃস্বপ্নের নগরী' আখ্যা দিয়েছিলেন, আন্দোলন দমনে লাঠি-গুলি চালানো হয়েছিল, কিন্তু 'পাবলিকের অসুবিধার' দোহাই দিয়ে এইভাবে মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আসেনি। অথচ আজ মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট-বন্‌ধের জন্য 'উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে', 'এ রাজ্যে পুঁজি নিয়োগ বন্ধ হচ্ছে' এই ধূয়া তুলে দেশী-বিদেশী শিল্পপতিরা ও বণিকসভা এইগুলি বন্ধ বা 'নিয়ন্ত্রণের' দাবি তুলছে। অথচ ব্রিটিশ শাসনের যুগে ও পরবর্তীকালে কংগ্রেস শাসনের কালে এরাজ্যে যখন মিটিং-মিছিল-শ্রমিক ধর্মঘট-সাধারণ ধর্মঘটের জোয়ার ছিল, তখন কিন্তু এ রাজ্য ভারতবর্ষে শিল্পক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে ছিল। আজ যখন সমগ্র দেশে এই রাজ্য লকআউটে শীর্ষস্থানে আর শ্রমিক ধর্মঘটে অনেক পেছনে, তখন এই প্রশ্ন উঠছে কেন? পুঁজিপতিরা নেহাৎ দয়াবশত কোথাও পুঁজি নিয়োগ করে না, মুনাফা লুণ্ঠনের স্বার্থেই করে। আন্দোলন থাকুক আর না থাকুক, যেখানেই শোষণের সুযোগ থাকবে, সেখানেই তারা পুঁজি ঢালবে। আজ যেখানে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শিরোমণি খোদ মার্কিন দেশে তীব্র বাজারসঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে ব্যাপক শিল্পাঞ্চল মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, পুঁজি বাইরে চলে যাচ্ছে, সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি প্রচণ্ড বাজারসঙ্কটে বিপর্যস্ত হচ্ছে, তখন শুধু এই রাজ্যে মিটিং-মিছিল-শ্রমিক ধর্মঘট-বন্‌ধের জন্য পুঁজি নিয়োগ হচ্ছে না, এটা কি কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে?

অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের আগেই আপনি নিজেই শিল্পপতিদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে 'জনস্বার্থে' মিটিং-মিছিল-শ্রমিক আন্দোলনে 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' আরোপের প্রস্তাব তুলেছেন। আপনার সরকার যখন হাসপাতাল পরিষেবাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করছে, বিদ্যুতের দাম, ছাত্রদের ফি, পরিবহনের ভাড়া বাড়াচ্ছে, দুধ ও রক্তের দাম বাড়াচ্ছে, নানা ট্যাক্স-খাজনা-সেস বাড়াচ্ছে, আপনার সরকার যখন কারখানার বেসরকারীকরণ, কর্মচারী সংকোচন, বোনাস কমানো, চুক্তিভিত্তিক কাজ চালু করছে, আপনার সরকারের আনুকূল্যে যখন দেশী-বিদেশী মালিকরা নির্বিচারে ছাঁটাই-ক্লোজার-মজুরি কমানো-পি এফের টাকা আত্মসাৎ করে যাচ্ছে, যখন এই রাজ্যে ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে বহু চাষী আত্মহত্যা করছে, যখন এই রাজ্যে ব্যাপক খুন-ডাকাতি-নারী ধর্ষণ চলছে, যখন হাজার হাজার নারী বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে, স্মাগলিং-জুয়া-সাট্টা-ড্রাগ-ব্লু ফিল্মের ব্যবসা বেড়েই চলেছে, তখন কিন্তু আপনার সরকারকে জনগণের স্বার্থ নিয়ে এতটুকু ভাবতে দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ এত ব্যগ্র হয়ে মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আনছেন কেন? সঙ্কটে জর্জরিত জনগণের ধূমায়িত বিক্ষোভ সরকার ও মালিকদের বিরুদ্ধে যাতে প্রবল আন্দোলনের রূপ না নিতে পারে, তার জন্যই কি এই ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না?

এই রাজ্যে আমাদের দল জনগণের নানা দাবিতে বহু বড় বড় মিটিং-মিছিল করে যাচ্ছে, নানা আন্দোলন ও বন্‌ধ করে যাচ্ছে। কিন্তু জনগণ অসুবিধা বোধ তো দুরের কথা, সবসময়ই সমর্থন করে যাচ্ছে। জনগণের যাতে কোন অসুবিধা না হয় এদিকে আমরা যথেষ্ট লক্ষ্যও রাখি। বড় মিছিল-সমাবেশের আগে জনগণকে আগাম জানিয়েও রাখি। অবশ্য জনগণ না করলেও, এই আন্দোলনগুলির ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং মালিকশ্রেণী যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করে, এটা পরিষ্কার ও স্বাভাবিক।

নানা দাবি সম্বলিত ব্যানারে সুসজ্জিত, দৃপ্তকণ্ঠে বলিষ্ঠ স্লোগানে মুখরিত, উন্নত সংস্কৃতির আধারে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ মিছিলের ধারাবাহিকতা সংগ্রামের পক্ষে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। প্রকৃতপক্ষে এই জন্যই মিছিলের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা। ট্রাফিক সিগনাল মেনে মিছিল চলতে দেওয়ার ও ভাগ ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব মিছিলের এই প্রাণসত্তাকেই হত্যার সামিল। তাছাড়া ছোট মিছিল সব সময়ই রাস্তার এক ধার দিয়েই চলে, কিন্তু ১০/২০/৫০ হাজার লোকের মিছিল, লক্ষাধিক লোকের মহামিছিল নিয়ে এটা ভাবাও চলে না। ব্রিটিশ শাসনের যুগ ও পরবর্তীকালে এতদিন পর্যন্ত শহরের যেকোন পার্কে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মিটিং করার যে অধিকার ছিল, তাকেও সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাব গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করারই এক ষড়যন্ত্র ফলে এটাও মানা যায়না। কিছু ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্মরণ দিবস থাকে, যেগুলি নিয়ে সেদিনই উদযাপন সমাবেশ করতে হয়। ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, গুজরাটে 'সাম্প্রদায়িক' গণহত্যা, বি সি রায় হাসপাতালে শিশুমৃত্যু — এই ধরনের ইস্যুতে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা করতে হয়। ছুটির দিন খুঁজে এইগুলি করার প্রস্তাবও প্রকারান্তরে এইগুলির গুরুত্ব হাল্কা করারই সামিল এবং এই কারণেই তা সমর্থনযোগ্য নয়।

ফলে আমাদের দল রাজ্য সরকার আনীত এই প্রস্তাবকে জনস্বার্থবিরোধী, অগণতান্ত্রিক ও গণআন্দোলন দমনের হাতিয়ার গণ্য করে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করছে। এটা স্বাভাবিক, যেসব দল পুঁজিপতিদের টাকায় ও তাদের স্বার্থে গদীর রাজনীতি করছে, তারা আপনার সরকারের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে, বড়জোর কিছু সংশোধনী দেবে। কিন্তু শোষিত-অত্যাচারিত জনগণের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন গণআন্দোলনে নিযুক্ত আমাদের দল কখনই এই প্রস্তাবকে মানতে পারে না।

মিটিং-মিছিল-প্রতিবাদ-আন্দোলন কলকাতার প্রাণ ছিল, সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত করতো। আজ দেশী-বিদেশী পুঁজির স্বার্থে ও সরকারবিরোধী আন্দোলনের গতিরোধ করতে আপনারা এই মহানগরীর সেই প্রাণকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। পরিণামে শোষণ-অত্যাচার আরও বেপরোয়া হয়ে চলবে, যুক্তিবাদী-প্রতিবাদী মনন বিনষ্ট হবে, ছাত্র-যুব শক্তির নৈতিক মেরুদণ্ড আরও ভেঙে পড়বে এবং মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সমগ্র রাজ্যকে গ্রাস করবে। এর জন্য ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না।

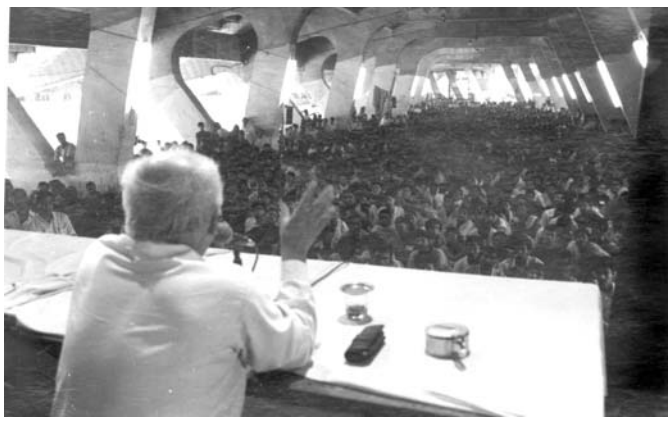

ডি ওয়াই ও-ডি এস ও'র রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গত ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। মঞ্চে ছাত্র-যুব নেতারা ছাড়াও ছিলেন রাজ্যসম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেডস্ গোপাল কুন্ডু, সুনীল মুখার্জী ও সৌমেন বসু।

লক্ষ্ণৌতে শিক্ষা সেমিনার

অল ইণ্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরের দারুল-সাফা বি ব্লক কমন হলে ২৮ সেপ্টেম্বর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ আইনজীবী লক্ষ্মীনারায়ণ যাদবের সভাপতিত্বে সেমিনারটি পরিচালনা করেন আইনজীবী লালতা প্রসাদ। কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি ডঃ সুধাংশুকুমার মালব্য দেশের শিক্ষার করুণ অবস্থা তুলে ধরেন এবং কীভাবে শিক্ষার উপর একের পর এক আঘাত নামিয়ে আনা হচ্ছে তা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষার উপর এই আক্রমণ আসলে মানবিকতা মারারই চক্রান্ত। প্রবীণ সাংবাদিক জগন্নাথ ভার্মা বলেন, কি কেন্দ্র কি রাজ্য উভয় সরকারই শিক্ষাকে ধ্বংস করতে চায়। সারা দেশের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতেও শিক্ষা বাঁচানোর আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি আবেদন জানান। এছাড়াও সেমিনারে বক্তব্য রাখেন অনিল কুমার সিং, আর ডি আনন্দ, অনিল কুমার মিশ্র, সহদেব সিং গৌতম সহ আরও অনেকে। সেমিনারের সভাপতি লক্ষ্মীনারায়ণ যাদব বলেন, শিক্ষার উপর এই আক্রমণের পিছনে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য কাজ করছে। আমরা এই আক্রমণের প্রতিবাদ করছি সেই উন্নততর রাজনৈতিক মূল্যবোধ থেকে, যে রাজনীতি মানবসভ্যতার প্রগতির পথপ্রদর্শক।

সেমিনারের শেষে লক্ষ্মীনারায়ণ যাদবকে সভাপতি ও লালতা প্রসাদকে সম্পাদক করে সেভ এডুকেশন কমিটির লক্ষ্ণৌ শাখা কমিটি গঠন করা হয়। ব্যাপক সদস্য সংগ্রহ করে আরও বৃহত্তর কমিটি গড়ে তোলার প্রস্তুতি সহ আগামী ৩ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ বিধানসভার সামনে অবস্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করে নির্বাচিত কমিটি।

মার্কিন-ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক শাসনের মহিমা !

গত শতাব্দীর '৬০-'৭০ দশকে ভিয়েতনামে শোচনীয় পরাজয়ের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধস্পৃহা কৌশলগত কারণে খানিকটা স্তিমিত হলেও '৯০ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর তা আবার তীব্র আকার ধারণ করে। তখন থেকে তারা নানা অজুহাতে হিংস্র নেকড়ের মত পরদেশ আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে। এক এক করে ১৯৯১ সালে ইরাকে, '৯৭ সালে যুগোস্লাভিয়ায়, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে এবং গত ২০ মার্চ আবার তারা ইরাক আক্রমণ করে ধ্বংসের বীভৎসতায় পৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছে। এবং অতীতের সব আক্রমণের মত এবারের ইরাক আক্রমণেও ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা হাতিয়ার করেছিল কুৎসিত মিথ্যা প্রচারকে। সাম্প্রতিক ইরাক আক্রমণের আগে যে তিনটি আক্রমণ তারা '৯০-এর দশকে করেছিল তার মিথ্যাপ্রচার সমস্ত মানুষকে না পারলেও অনেককে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। মার্কিন নাগরিকরা এবং বিশ্বের বিরাট সংখ্যক মানুষ এই মিথ্যাপ্রচার ধরতে পারেনি। কিন্তু এবারের ইরাক আক্রমণে তাদের এই মিথ্যাপ্রচারের জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাদের মিথ্যার কদর্যরূপ বিশ্বের সামনে নগ্ন হয়েছে। সকলেই জেনে গিয়েছে, এই আক্রমণ দুই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বদস্যুর পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং এর লক্ষ্য ইরাক দখল করা ও তার সমৃদ্ধ তেল সম্পদের মালিক হওয়া। ইরাককে আক্রমণ করার আগে মার্কিন শাসকরা পুরনো কায়দাতেই একটার পর একটা মিথ্যার জাল বুনেছে, মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

প্রথম তারা অভিযোগ তুলল — ইরাকে কোন গণতন্ত্র নেই, সাদ্দাম হোসেন স্বৈরাচারী একনায়ক, অতএব সাদ্দাম সরকারকে হঠাতে হবে, ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সীমাহীন স্পর্দ্ধা! শত সহস্র মাইল দূর দেশের শাসকরা চায় না বলেই অপর একটি দেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকারকে সরে যেতে হবে। এর বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মানুষ ধিক্কার জানাল। কোন স্বৈরাচারী শাসককে যদি সরাতে হয়, তাহলে সরাবে সেই দেশেরই মানুষ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাকে সরাবার কে? ইরাকের গণতন্ত্র, তার 'স্বৈরাচারী শাসক'কে নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এত দুশ্চিন্তা! ভাবখানা যেন নিজেরা গণতন্ত্রের মহান পূজারী! কিন্তু মার্কিন শাসকদের 'গণতন্ত্রের' নমুনা কি? চিলির পিনোচেট, উগাণ্ডার ইদি আমিন, পানামার নোরিয়েগা (পরে ইনি মার্কিনবিরোধী হওয়ার পর আমেরিকার সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে বসানো ওর্তেগা), — মাত্র কয়েকটি উদাহরণ — এরা কারা? এদের শাসনের চরিত্র কি? এইসব সামরিক শাসকরা সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মার্কিন মদতে নির্বাচিত সরকারের প্রধানদের খুন করে, ঐসব সরকারকে উচ্ছেদ করে শাসন ক্ষমতায় বসেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। গোটা দেশকে জেলখানায় পরিণত করেছিল। শুধু তাই নয়। চরম মৌলবাদী কুয়েত, সৌদি-আরবের সামন্তী শাসকরাও ঐ মার্কিন শাসকদের পরম মিত্র। এরা কি গণতন্ত্রী? এই সৌদি-আরবেই লালিত পালিত মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেন — যাকে ধরার নাম করেই মার্কিন শাসকরা ২০০১ সালে আফগানিস্তান ধ্বংস করেছিল, অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছিল। সেই লাদেনও তো আমেরিকারই সৃষ্টি এবং তারা সন্ত্রাসবাদী লাদেনকে ব্যবহার করেই আফগানিস্তানের নির্বাচিত নাজিবুল্লা সরকারকে উৎখাত করে, মৌলবাদী তালিবানি সরকারকে আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানে মার্কিন শাসকদের তথাকথিত গণতন্ত্র কোথায়? খোদ নিজের দেশেই বা গণতন্ত্রের চেহারা কি? এই সেদিন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত গণতন্ত্রের ইজারাদার আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার ছিলনা। কৃষ্ণাঙ্গরা ওদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। একই কাজে শ্বেতাঙ্গদের থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের বেতন অর্ধেক। ওখানে প্রতি ৫ জন জেলবন্দীর ৪ জনই কৃষ্ণাঙ্গ। সাম্প্রতিকতম প্যাট্রিয়ট-২ আইন কি গণতান্ত্রিক? এই আইনে যখন তখন যেকোন মানুষকে শুধু সন্দেহ বশেই গ্রেপ্তার করা যাবে। এই আইনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানারও বিশেষ দরকার নেই। এবং অনন্তকাল ধরে বিনাবিচারে বন্দী করে রাখা যাবে। অভিযুক্ত কোন আইনের সাহায্য পাবে না, আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন কৌঁসুলি নিয়োগ করতে পারবে না। অবস্থা এমন যে সাধারণ মানুষের চিঠি, ই-মেইল, ইন্টারনেটে যেকোন সময় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এই হচ্ছে মার্কিনি গণতন্ত্রের মহিমা!

ফলে, ইরাকের গণতন্ত্র নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দুশ্চিন্তা নিতান্তই ভণ্ডামি। এতে বিশ্বের ও নিজের দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করা কঠিন হবে বুঝেই সাদ্দাম হুসেনের সাথে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগের অভিযোগ তোলা হল এবং সেই সূত্র ধরেই মিথ্যা প্রচারের তুমুল হাওয়া তুলে বলা হল — ইরাক নাকি গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের রাসায়নিক জৈবিক অস্ত্রের 'বিশাল ভাণ্ডার' গড়ে তুলেছে। মার্কিন সরকারের গোয়েন্দারা নাকি সব ধরেও ফেলেছে। তারা অবশ্য জানাল যে, তাদের অনুমান (লক্ষ্য করুন শব্দটি) সাদ্দাম হুসেনের কাছে ৫০০ টন সারিস, মাস্টার্ড ও ভি এক্স নার্ভ এজেন্ট উৎপাদন করার মত উপাদান আছে, যা দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে মারা যেতে পারে। শুধু তাই নয়। এই রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের জন্য (সাদ্দামের কাছে) ৩০ হাজার যুদ্ধোপকরণও (munitions) আছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী **ও** তার সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর ৫০ পাতার দলিল প্রকাশ করে জানাল যে, সাদ্দামের ঐ রাসায়নিক-জৈবিক অস্ত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে সক্রিয় করা যেতে পারে। ফলে অতি দ্রুত সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করতে না পারলে বিশ্বের আর রেহাই নেই। এই বক্তব্য জর্জ বুশ মহা সত্য বলে সোচ্চারে ঘোষণা করল। মার্কিন শাসকরা অভিযোগ করছিল যে, ইরাক এমনকি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টাও করছে। এ ব্যাপারে টনি ব্লেয়ার সরকারের ঐ দলিল বুশকে সমর্থন করল এই বলে যে, সাদ্দাম হুসেন নাকি আফ্রিকার নাইজার থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করছিলেন। সুতরাং সাদ্দামকে তাড়াতে হবে, ইরাক দখল করতে হবে, নতুবা বিশ্ব রক্ষা পাবে না !

এ অভিযোগ কারা তুলল ? তুলল সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ব্রিটিশ লেজুড় — যারা পারমাণবিক বিষে জারিত (ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম তারই প্রতিরূপ) হাজার হাজার টন বোমা ফেলে, লেজার চালিত ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে, উন্নত প্রযুক্তি কৌশলে নির্মিত ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটায়, বীভৎস বিধ্বংসী ক্রুইজ মিসাইল প্রয়োগ করে। এবং তার দ্বারা শতসহস্র শিশু নারী বৃদ্ধ সহ হাসপাতালের রোগীদের খুন করে। এরপরও তারা পৈশাচিক উল্লাসে বলে, এ হল 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' অর্থাৎ আনুষঙ্গিক ক্ষতিমাত্র। এরা বিষাক্ত বোমার প্রতিক্রিয়ায় দুরারোগ্য ক্যান্সারসহ বহু মারণ ব্যাধি ছড়িয়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে ধীরে অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, বহু মানুষকে চিরজীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়, আগামী কয়েক প্রজন্মের শিশুদের বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোর পরিবেশ সৃষ্টি করে, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর ধূলিসাৎ করে দেয় এবংএইভাবে পরদেশ দখল করে তার প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজের দেশের একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এদের হাতে হাজার হাজার আণবিক, হাইড্রোজেন বোমা আছে, জৈবিক-রাসায়নিক অস্ত্রের কারখানা আছে যেখানে টন টন এই অস্ত্র, যাকে ওরা ডার্টি বম্বস্ বা গণধ্বংসী মারণাস্ত্র বলছে, তা উৎপাদিত হয়। এদের মুখে ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ নিকৃষ্ট ভণ্ডামি !

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের এইসব তথাকথিত দলিল বা গোয়েন্দা রিপোর্ট যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভাঁওতা, জাল, তা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। জানা গেল, টনি ব্লেয়ারের 'দলিল' সাদ্দামবিরোধী এক ইরাকি গবেষকের গবেষণাপত্র থেকে নকল করা হয়েছিল। বেরিয়ে গেল যে, 'ইউরেনিয়াম' বা '৪৫ মিনিটের গল্প' ভুয়া। বি বি সি এ তথ্য ফাঁস করে দিল। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রবীণ অফিসার ডঃ কেলির কাছ থেকেই বি বি সি এই তথ্য পেয়েছে, এটা জানাজানি হতেই টনি ব্লেয়ারের সরকার তাঁর উপর মানসিক অত্যাচার শুরু করল, তিনি 'আত্মহত্যা' করতে বাধ্য হলেন। এও গণতান্ত্রিক শাসনেরই নমুনা বটে ! এই মিথ্যাচার আরো নগ্নভাবে প্রমাণিত হল যুদ্ধে ইরাক ধ্বংসের পর, ইঙ্গ-মার্কিন শাসকদের দখলের পর। ১৪০০ অস্ত্র পরীক্ষক ২৩০টি জায়গায় পরীক্ষা করে একটিও মারণাস্ত্র খুঁজে পায়নি। এমনকি, বুশ নিয়োজিত সি আই এ-র ডিরেক্টর গত সেপ্টেম্বর মাসে জমা দেওয়া রিপোর্টে এই কথাই জানাল যে, ইরাকে কোন মারণাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা তৈরি করার প্রচেষ্টাও সে দেশে হয়নি। নাইজার থেকে ইউরেনিয়াম আনার প্রচারও ভুল। ঠিক এই কথাই আক্রমণের আগে রাষ্ট্রসংঘের পাঠানো অস্ত্রপরীক্ষক হান্স ব্লিক্স ও আন্তর্জাতিক আণবিক অস্ত্রপরীক্ষা সংস্থার প্রধান মহম্মদ এল-বারেদেই ঘোষণা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতিভূরা ফ্যাসিস্ট গোয়েবলসের মতো একই মিথ্যা বার বার প্রচার করে তাকেই সত্য বলে চালিয়েছে। মানবজাতির প্রাচীনতম এক সভ্যতার নিদর্শন ইরাককে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এটা দেখেই হান্স ব্লিক্স হয়ত ঐ মার্কিন শাসকদের 'বাস্টার্ড' বলেছিলেন। অর্থাৎ মিথ্যার জারজ সন্তান ! এই তো আমেরিকা-ব্রিটেনের 'গণতন্ত্র' ! তার এমনই মহিমা যে, জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের মতো এমন ভয়ঙ্কর আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধী, শিশু হত্যাকারী, নরহত্যাকারী মানব শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংসদে কোন অনাস্থা বা ইমপিচমেন্ট এল না ! বরং দু-একজন বাদে সকল সাংসদরাই এদের সমর্থন করল। অবশ্য আমেরিকা-ব্রিটেনের সাধারণ মানুষ আজ তাদের দেশের যুদ্ধবাজ শাসকদের বিরুদ্ধে উত্তাল, তারা রাস্তায় নেমে লড়াই করছে।

ইরাকি জনসাধারণ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা তাদের দেশ দখল, পরাধীনতা মেনে নেয়নি। মুক্তির আকাঙ্খায় ইরাকি যুবকরা আত্মঘাতী আক্রমণ করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কথাতেই প্রতিদিন গড়ে ৩৬ বার ইরাকি হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে মার্কিন সেনাদের। ইরাকিদের এই গেরিলা যুদ্ধে গণ্ডায় গণ্ডায় মার্কিন সেনা প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকারি হিসাবেই গত মে থেকে ১৫০ জন সৈন্য মারা গিয়েছে এবং এই সরকারি হিসাবও যে অনেক কম, তা সকলেই বোঝে। মার্কিন ও ব্রিটিশ উভয় শাসকরাই তাদের সৈন্যদের বুঝিয়েছিল যে, ইরাকে তাদের পাঠানো হচ্ছে 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা' প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই মিথ্যা ফাঁস হয়ে গেল তখন, যখন সৈন্যরা দেখল, ইরাকের জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দখল থেকেই মুক্তি চাইছে। শুধু তাই নয়, সৈন্যরা দেখল যে 'যুদ্ধ' শেষেও তাদের বাড়ি ফেরার

ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্কিন চিনুক বিমান ধ্বংস করার আনন্দে উল্লাস করছে ইরাকি শিশুর দল

ব্ল্যাক হক কপ্টার ধ্বংস করল ইরাকি গেরিলারা

এক সপ্তাহের মধ্যে ইরাকি গেরিলারা মার্কিন বাহিনীর আরও একটি বিমান ধ্বংস করল। ১লা নভেম্বর বাগদাদের সন্নিকটে একটি ইউ এস চিনুক বিমান ধ্বংস করলে তাতে ১৬ জন আমেরিকান সেনা নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল অনেকে। ৭ নভেম্বর তিকরিতে সম্ভবত রকেট চালিত গ্রেনেড হানার ফলেই ধ্বংস হয় এই ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারটি — যা কিনা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজুড়ে আমেরিকান সামরিক আধিপত্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর ফলে নিহত হয় ৬ জন আমেরিকান সৈন্য। গ্রেনেড হানার ফলে বিমানটি প্রবল বিস্ফোরণে টাইগ্রিস নদীর তীরে ভেঙ্গে পড়ে। এছাড়াও ঐদিন রাতে তিকরিতের আমেরিকান সেনাবাহিনীর প্রধান কম্পাউণ্ডে দুটি মর্টার বোমা ছোঁড়া হয়। মার্কিন মিলিটারী কর্তারা জানিয়েছে, মসুলে গত বৃহস্পতিবার বোমা আক্রমণে একজন এবং শুক্রবার চোরাগোপ্তা আক্রমণে অপর একজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (সূত্রঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া, ৮-১১-০৩)

হায়দ্রাবাদে অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সভা

অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী ১৫-১৬ নভেম্বর কলকাতায় যে সর্বভারতীয় কনভেনশন হতে চলেছে তার প্রাক্কালে কমিটির অন্ধ্রপ্রদেশ প্রাদেশিক শাখার পক্ষ থেকে ৩০ অক্টোবর হায়দ্রাবাদ প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সভাপতি অধ্যাপক জি হরগোপাল।

সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক হরগোপাল বলেন, যে-কোন দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণের যথার্থ অধিকারী হল সে দেশের জনগণ। অন্য কোন রাষ্ট্র, তা সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কোন ছলেই আর একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হরণ করতে পারে না। কে ইরাকের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে, আর কে করবে না, তা ইরাকের জনসাধারণই স্থির করবে। যদি তারা কোন শাসককে স্বৈরতন্ত্রী বলে মনে করে, তবে তারাই তাকে উৎখাত করবে এবং কোনও ভালো শাসক নির্বাচিত করবে। যদি কোন ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র তার প্রভূত সামরিক শক্তির জোরে এবং গণতন্ত্র উদ্ধারের নামে একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশে প্রবেশ করে এবং যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তবে বিশ্বের দরবারে তা এই বার্তাই পাঠায় যে, ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা ক্ষমতাশালী বর্ণের মানুষেরা যথাক্রমে দুর্বলতর রাষ্ট্র, ব্যক্তি এবং বর্ণের মানুষের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে পারে, যা শেষপর্যন্ত গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেই নস্যাৎ করে। আমেরিকার উচিত এই মুহূর্তে ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার করা।

অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন সদস্য সরদার আলি খান বলেন, লীগ অব নেশনস্-এর পরিবর্তে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুদ্ধ প্রতিরোধ করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই এবং তার অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলিও নানা বিধি এবং ঘোষণার আকারে নথিভুক্ত রয়েছে। ইরাক বা অন্য কোন দেশের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার কোন প্রমাণ যদি আমেরিকার কাছে থেকে থাকে, তবে তার উচিত সেগুলি রাষ্ট্রসংঘ বা নিরাপত্তা পরিষদের মতো সংস্থা, যাদের হাতে বিশ্বের শান্তি এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে, তাদের সামনে পেশ করা। প্রথমে আফগানিস্তান এবং পরে ইরাক আক্রমণের সময়ে আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘের আইন এবং অন্যান্য সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করেছে। গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র তো দূরের কথা ইরাকে আমেরিকা এখনও, কোন সাধারণ অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারেনি। সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার মত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকেও আমেরিকা খোলাখুলি হুমকি দিয়ে চলেছে। আমেরিকার এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বের সমস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে।

NALSAR বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভি রামকৃষ্ণ বলেন, ভারতের এক দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য রয়েছে। অথচ দেশের শাসকরা এখন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে দহরম-মহরম করছে — যা আমাদের দেশ এবং দেশের জনসাধারণের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। একের পর এক দেশের অধিকার এবং সার্বভৌমত্বকে আমেরিকা পদদলিত করে চলেছে এবং এইভাবে বিশ্বশান্তিকেও বিপন্ন করে তুলছে। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের এক সার্বিক ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে এবং দেশের মানুষ যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয়নি সে বার্তা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটিই যথার্থ সময়। আমেরিকা এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ইরাকের মাটি থেকে তল্পিতল্পাসহ বিতাড়িত করতে হবে।

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কে শ্রীধর বলেন, সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের জন্ম দেয় এবং সঙ্কট জর্জরিত অর্থনীতিকে কৃত্রিমভাবে চাঙ্গা করতে অর্থনীতির সামরিকীকরণ আজ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে যারাই নতিস্বীকার না করছে তাদেরই আক্রমণ করা হচ্ছে। বিশ্ব থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উৎখাত করার জন্য তিনি দেশের মানুষকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রবীণ এ্যাডভোকেট প্রত্তিপতি ভেঙ্কটশারালু, 'ফোরাম ফর মডার্ণ থট অ্যাণ্ড লিটারেচার'-এর সম্পাদক কাদির জামান, শ্রী মুরাহরি ও শ্রী আপ্পা রাও সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।

রাজ্যের বহু বিশিষ্ট মানুষের স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র সভা থেকে সংবাদমাধ্যমগুলিকে দেওয়া হয়।

আমেরিকাতেও অনাহার

খবরটা সংবাদপত্রের এক কোনায় প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু বিস্মিত করবে অনেককেই। বিশেষত তাঁদের, আমেরিকা বলতেই যাঁদের চোখে রঙিন ছবি ভেসে ওঠে, যাঁরা মনে করেন আমেরিকার মানুষ মাত্রই সুখী সচ্ছল জীবন কাটান, আমেরিকা মানেই সম্পদ ও ভোগের প্রাচুর্য। ছোট্ট খবরটা হচ্ছে, আমেরিকায় এক দল মানুষ যখন শরীরের মেদ কমাবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তখন ক্ষুধার্ত পরিবারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে — যাঁরা জানেন না, আগামী কাল খাদ্য যোগাড় করতে পারবেন কিনা।

মার্কিন কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত তথ্য বলছে, প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষের মত পরিবার অনাহারের আশঙ্কায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ, তাদের হাতে প্রয়োজনীয় খাবার কেনার পয়সা নেই। এদের মধ্যে শতকরা ৩২ শতাংশ পরিবারের কোন না কোন সদস্য ইতিমধ্যে অনাহারেও কাটিয়েছেন। গত বছর এই সংখ্যাটা ছিল ৩৮ লক্ষ। ২০০১ সালে ছিল ৩৫ লক্ষ। অর্থাৎ মাত্র দু'বছরে আমেরিকায় ক্ষুধার্ত, প্রায় অনাহারী পরিবারের সংখ্যা ৮৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেন্সাস ব্যুরোর একটি সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে মার্কিন কৃষি বিভাগ এই রিপোর্ট তৈরি করেছে। ১ কোটি ২০ লক্ষ পরিবারের অর্থ হচ্ছে, পরিবার পিছু কমপক্ষে ৪ জন সদস্য ধরে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ। বিশ্বের এক নম্বর ধনী দেশ, সমগ্র বিশ্বের সম্রাট বলে নিজেকে গণ্য করতেই যে ভালবাসে, সেই ২৫ কোটি মানুষের দেশ আমেরিকায় প্রায় ৫ কোটি মানুষ আজ অনাহারে দিন কাটায় এবং যত দিন যাচ্ছে, সংখ্যাটা বাড়ছে।

গরিবিও যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে ধনীর ধনলালসা ও সঞ্চিত সম্পদ। আমেরিকার সবচেয়ে ধনী মানুষদের সম্পদের পরিমাণও ২০০২ থেকে '০৩ এই এক বছরের মধ্যে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫ হাজার ৫০০ কোটি ডলারে (৯৫৫ বিলিয়ন ডলার) পৌঁছেছে। ঠিক এই সময়ই আমেরিকায় কাজ হারিয়েছে ২৭ লক্ষ শ্রমিক।

সুতরাং, গরিবের আরও গরিব হওয়া, অন্যদিকে ধনীর আরও ধনবৃদ্ধি ; শ্রমিকের ছাঁটাই হওয়া, অন্যদিকে মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি — এই যে নিয়ম ভারতবর্ষে আমরা কঠিন অভিজ্ঞতায় দেখছি, আমেরিকাতেও সেই একই নিয়ম চলছে। এটাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই নিয়ম ও পরিণতি থেকে বেরোবার রাস্তা নেই।

গণতান্ত্রিক শাসনের মহিমা !

পাঁচের পাতার পর

উপায় নেই। কারণ, মার্কিনদের সমস্ত তেল সম্পদের দখল এখনও সুনিশ্চিত হয়নি। সৈন্যরা এই মানসিক চাপ সইতে না পেরে দলে দলে আত্মহত্যা করছে। ইরাক থেকে বাড়িতে পাঠানো সৈন্যদের চিঠি থেকে ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে যে, তারা কী মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে, ইরাকের জনগণের চোখে মুখে তাদের প্রতি ঘৃণা দেখে ঘরে ফেরার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এদের আমেরিকায় ফিরিয়ে আনার জন্য সেনাদের পরিবার ও অন্যান্যদের থেকে দাবি যখন জোরালো হচ্ছে, তাকে চাপা দেওয়ার জন্য মার্কিন শাসকদের আর একটি অভিনব কিন্তু হীন মিথ্যা মার্কিন জনগণকে স্তম্ভিত করেছে। ঘটনাটা এইরকম ঃ হঠাৎ একটি চিঠি আমেরিকার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। তাতে ইরাকে অবস্থিত এক মার্কিন সেনা লিখছে, "প্রচণ্ড তাপ উপেক্ষা করেও সৈন্যরা যখন রাস্তায় টহল দিচ্ছিল, তাদের দেখে ইরাকের জনসাধারণ হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে।" চিঠি বলছে, "সৈনিকদের প্রতি কৃতজ্ঞ ইরাকী শিশুরা হাসতে হাসতে দৌড়ে এসে তাদের সৈন্যদের করমর্দন করছে এবং ভাঙা ইংরেজিতে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।" পরে দেখা গেল, এই একই বয়ানের চিঠি দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য সৈনিকের নামে, প্রকাশ হয়ে গেল এক জঘন্য জালিয়াতি। জানা গেল, সরকারের পার্সোনেল বিভাগ থেকে এই ধরনের চিঠি সমস্ত সংবাদপত্রগুলোতে পাঠানো হয়েছে। কোন সৈনিকই এই চিঠি লেখেনি। সৈন্যরা তাদের বাড়িতে লিখছে অসুবিধার কথা, একাকীত্বের কথা, এবং একঘেয়েমির কথা। সংবাদপত্রের ঐ চিঠি সম্পূর্ণ জাল।

এই জালিয়াতির প্রতিবাদ জানিয়ে, ইরাকে দখলদারি বন্ধ করে মার্কিন সেনাদের ঘরে ফেরানোর দাবিতে লাখে লাখে মানুষ ২৫ অক্টোবর আমেরিকার নানা শহরে পথে নেমেছিল। ইরাকের জনগণের সংগ্রামের সাথে মার্কিন জনগণের সংগ্রাম আজ এক হয়ে গেছে। প্রয়োজন আজ গোটা বিশ্বেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণসংগ্রাম গড়ে তোলা। সে আহবান সামনে রেখেই ১৫ ও ১৬ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন।

শহিদ মাধাই হালদার স্মৃতি শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট

গত ১৩ থেকে ১৫ অক্টোবর তিনদিনব্যাপী বীরভূমের 'মিত্রপুর প্রগতিশীল যুব গোষ্ঠী'র পরিচালনায় শহিদ মাধাই হালদার স্মৃতি শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হল। এই টুর্নামেন্টে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মোট ১৪টি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। খেলায় বিজয়ী হয় মুর্শিদাবাদ জেলার নাইত দুর্গা সংঘ এবং রানার্স হয় বীরভূমের ভাটরা সবুজ সংঘ। মাধাই হালদার স্মৃতি শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জিয়াদ বক্সী, বিশেষ অতিথি এস ইউ সি আই বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রফিকুল হাসান ও স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষক মহম্মদ নুরুল আকসার। প্রগতিশীল যুব গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মজিবর হোসেন (মিলন) সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সংরক্ষণের ইস্যুতে সরকারি দলগুলো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন

অতি সম্প্রতি কংগ্রেস পরিচালিত রাজস্থান সরকার, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের মতো উচ্চবর্ণের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ মানুষদের জন্য চাকরি ও জীবিকার ক্ষেত্রে ১৪ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করেছে। মূলত উচ্চবর্ণের স্বার্থরক্ষক বিজেপি এর ফলে হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে ভোটে এর সুফল কংগ্রেসের হাত থেকে কেড়ে নিতে তড়িঘড়ি কাজে নেমে পড়েছে এবং উচ্চবর্ণের এই সংরক্ষণকে বৈধতা দিতে কীভাবে সংবিধান সংশোধন করা যায় এবং তার দ্বারা কংগ্রেসকে টেক্কা দেওয়া যায় তা বিচার বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করার জন্য তাদেরই দলের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছে। তাদের দলেরই প্রধানমন্ত্রী জয়পুরে এক জনসভায় সংবিধান সংশোধন করে এই মর্মে আইন তৈরি করার কথাও বলেছেন। সাথে সাথে কংগ্রেস তো বটেই, এমনকি সি পি আই(এম)-ও তা সমর্থন করেছে। এও লক্ষণীয় যে, রাজস্থান সহ যেসব রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন সেখানে নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস ও বিজেপি, দু'পক্ষই উচ্চবর্ণের এই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এছাড়াও এই সুযোগে তফশিল বহির্ভূত পশ্চাদ্‌পদ জাতির (ওবিসি) তালিকায় নতুন নতুন নাম ঢোকাতে চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যেই তারা দিল্লিতে জুনহা আনসারি, ইদ্রিশী, নাদফা এবং মনসুরদের; রাজস্থানে শিলওয়াজ, সোমপরশ এবং মূর্থিকালদের, তারুপা কাপু সহ হরিয়ানা ও ওড়িশায় সেই সেই রাজ্যের ওবিসি-দের নতুন করে ওবিসি তালিকায় ঢুকিয়েছে। বিজেপির লক্ষ্য হল, নির্বাচনে ফায়দা লুটতে উচ্চবর্ণের সমর্থন অটুট রাখা এবং ওবিসি জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা।

প্রশ্ন হল, হঠাৎ এইসব দলগুলি সংরক্ষণের ইস্যুতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন? নতুন করে যাদের নাম জন্মসূত্র ধরে সংরক্ষণের তালিকায় ঢোকানো হচ্ছে, সেইসব মানুষদের কী উপকার এতে হবে? এতদিন ধরে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করার কোন সুফল পশ্চাদ্‌পদ জাতির গরিব মানুষেরা কি পেয়েছেন? সংরক্ষণ হলেই সমস্যা মিটবে এমন ধারণায় যাঁরা গা ভাসাচ্ছেন, তাঁদের এও ভাবতে হবে যে, পশ্চাদ্‌পদ যুবকদের কর্মসংস্থান দেওয়ার মতো উপযুক্ত অবস্থায় কি দেশের অর্থনীতি রয়েছে? দেখা যাক্, কৃষি এবং শিল্প, অর্থনীতির এই প্রধান দু'টি ক্ষেত্রের অবস্থা কী।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মের অনিবার্য পরিণতিতে আমাদের দেশে অধিকাংশ জমি গ্রামীণ পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় গরিব ও প্রান্তিক চাষী ক্রমাগত জমি হারিয়ে ভূমিহীন খেতমজুর ও গ্রামীণ মজুরে পরিণত হয়েছে। পরিবারে কর্মক্ষম সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জমি বা অন্য জীবিকার সুযোগ বাড়েনি। তাছাড়া ক্রমাগত চাষের খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার ও কৃষিপণ্যের একচেটিয়া কারবারিরা হাত মিলিয়ে ফসল ওঠার সময় বাজারে কৃষিপণ্যের দাম কমিয়ে দেওয়ায় গরিব ও প্রান্তিক চাষীরা ফসলের উপযুক্ত দাম না পেয়ে জমি ধরে রাখতে পারছে না। অভাবে-ঋণে জর্জরিত চাষী জমি বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে খেতমজুররা বছরে সর্বাধিক ২০০ দিন বা তার কম কাজ পায়। তার ওপর কৃষি উৎপাদনে মুনাফার স্বার্থে সীমিত অর্থে যতটুকু আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে, তার ফলে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ক্রমাগত কমছে। ফলে, কৃষি থেকে কাজ হারানো শ্রমিকরা এবং কৃষক হলেও যাদের জমি থেকে আয় অতি নগণ্য, তারা দলে দলে কাজের আশায় শহরে ছুটছে।

কিন্তু কাজ কোথায়? শিল্পগুলি চরম বাজার সঙ্কটের আবর্তে। একটানা দীর্ঘ পুঁজিবাদী শাসন দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতাকে নিংড়ে নিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য, যেটা আবার নির্ভর করে বাজারের উপর। এই 'বাজার' মানে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা। অর্থাৎ মানুষের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও জিনিসপত্র কেনার মতো আর্থিক ক্ষমতা না থাকার অর্থ হচ্ছে 'বাজার নেই'। একদিকে বাজারের অভাবে হয় কলকারখানা পুরো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, না হয় লকআউট করা হচ্ছে। অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে, কাজ হারাচ্ছে, স্বেচ্ছাবসরের নামে জোর করে অবসর করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর দ্বারা বাজার আরও সঙ্কুচিত হচ্ছে। এ হচ্ছে একটা দুষ্টচক্র। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসংঘাতে পূর্ণ এই দুষ্টচক্র থেকে পুঁজিবাদ মুক্তি পেতে পারে না। দেশের ভিতরে বাজার না থাকায়, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশের বাজারে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং ব্রিটেন-আমেরিকার মতো অত্যন্ত শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এজন্য তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চালু করছে। শ্রমিক-প্রধান প্রকল্পের পরিবর্তে পুঁজি-প্রধান আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর প্রকল্পে চলে যাচ্ছে। ফলে 'ডাউন সাইজিং'-এর নামে ব্যাপকহারে শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে চলেছে তারা। অন্যদিকে বিদেশের বাজারে ঢোকার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথে সহযোগিতা ও আঁতাতের যে তত্ত্ব বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি নিয়ে এসেছে, সে অনুযায়ী ভারতীয় পুঁজি বিদেশী পুঁজির সঙ্গে মিলে যেমন বিদেশের বাজারে যাচ্ছে, আবার ভারতের দেশীয় বাজারকে সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা ভারতের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল লুট করছে। পরিণামে জনগণের গরিবি আরও বাড়ছে। এই হচ্ছে বহুবন্দিত বহু-পাক্ষিক (মালটিল্যাটারাল) বাণিজ্য প্রক্রিয়ার পরিণাম।

এসবের ফলে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা সর্বত্র বাড়ছে মারাত্মক হারে। এর সাথে যোগ করা দরকার শহরের বিশাল বেকার যুব বাহিনীকে। এর ওপর আছে গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে উৎখাত হওয়া চাষী ও গ্রামীণ মজুরের দল, যারা কাজের খোঁজে এসে শহরের বেকার বাহিনীকে বাড়িয়ে চলেছে। একটা বাস্তবসম্মত সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, ভারতের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি বেকার। বাকি ৫০ শতাংশকে কর্মে নিযুক্ত (employed) দেখানো হলেও, বাস্তবে এদেরও একটা বড় অংশ আধা-নিযুক্ত ও ছদ্ম বেকারের আওতাতেই পড়ে। এই ভয়াবহ ছবির মধ্য দিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিরসনীয় সঙ্কটের চেহারাই স্পষ্ট হয়। সঙ্কটের এই মূল কারণকে আড়াল করে ধূয়া তোলা হচ্ছে যে, শ্রমিক অশান্তি, বেতন দিতে ব্যয়বৃদ্ধি, কম উৎপাদন, দক্ষ কর্মীর অভাব ইত্যাদিই নাকি শিল্প সঙ্কটের জন্য দায়ী। এসব বস্তাপচা অজুহাত তুলে সঙ্কটের পুরো বোঝাটা মেহনতি জনগণের ঘাড়ে চালান করে দেওয়া হচ্ছে। এই মন্দা ও সঙ্কট শুধু ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই ঘটছে, তা নয়; গোটা পুঁজিবাদী বিশ্বেরই এখন এটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বহু শোরগোল তুলে বিশ্বায়ন আনা হয়েছিল মন্দা দূর করার দাওয়াই হিসাবেই। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, বিশ্বের বাজারকে যদি খুলে দেওয়া যায়, তবে অতি উৎপাদন ও মন্দার মতো ব্যাধিগুলিকে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, সঙ্কট কমার পরিবর্তে আরও তীব্র হচ্ছে। ক্রমেই বাজার সংকুচিত হচ্ছে এবং সেই ক্রমসংকুচিত বাজারে আপন আপন দখলদারি কায়েম করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব কদর্য রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সম্প্রতি কানকুনে ডব্লু টি ও'র ব্যর্থ বৈঠক। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থে বিশ্বায়নের মিছিলে ভিড়ে গিয়ে বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও উদারীকরণের ঢালাও ব্যবস্থা করেও সংকট থেকে রেহাই তো পায়ইনি, বরং গভীরতর সংকটের আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রচারযন্ত্রকে অবিরাম কাজে লাগিয়েও ভারতীয় কর্তারা সত্য গোপন করতে পারছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী গত এক বছরে ৫ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আরও ২.৫ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় আছে। যতটুকু তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশে কর্মসংস্থানের হার যেখানে ১৯৮৩-৯৪ সালে ছিল ২.৭ শতাংশ, সেখানে ১৯৯৪ - ২০০০ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১.০৭ শতাংশে। প্রত্যক্ষ সরকারি চাকরির অংশ মাত্র ০.৮ শতাংশ। বিজেপি চালিত কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, ১০ শতাংশ সরকারি চাকরি কমানো হবে। ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সরকারি ক্ষেত্রে চাকরির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু ২০০১-০২ সালেই ৫.২২ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে স্বেচ্ছাবসরের নামে বিদায় দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে চাকরির সুযোগ ১৯৮৩-৯৪ সালে ছিল ১.৫২ শতাংশ, যা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪-২০০০ সালে হয়েছে ০.৩ শতাংশ। সরকারের শ্রমিকবিরোধী নীতির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বেসরকারি ব্যক্তিমালিকরাও চাকরি কমাবার দৌড়ে নেমেছে। বস্তুত এখন বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশেই এই একই জিনিস ঘটছে। ২৫ কোটি জনসংখ্যার দেশ আমেরিকা। সেখানে ৬.৪ শতাংশ বেকার। ভারত সরকার যখন 'মন্দা কাটিয়ে উঠছে' বলে দাবি করছে, তখনই দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয়, রাজ্য, আধা-সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে চাকরির সুযোগ ক্রমাগত কমছে। ফলে সরকার যদি ১০০ শতাংশ সংরক্ষণও চালু করে, তাতেও যেসব অংশের মানুষদের চাকরি দেওয়ার কথা বলে এটা করা হচ্ছে, তাদের কোন অংশকেই চাকরি দেওয়া যাবে না। কারণ, এই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই চাকরির সকল সুযোগ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

এখন দেখা যাক, তফশিলি জাতি ও উপজাতির জনগণের জন্য গত ৫ দশক ধরে দেশে যে সংরক্ষণ নীতি চালু আছে, তার ফল কী দাঁড়িয়েছে। এইসব দলিত, দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের দুর্দশা লাঘবের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ যা ঘটেছে, তার সুফল এদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই সংরক্ষণ নীতির লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধান গ্রহণ করার সময়, সংরক্ষণ নীতির প্রবক্তারা অবশ্য বলেছিলেন যে, চিরদিনের জন্য এই সংরক্ষণ থাকা ঠিক নয়, তাতে দলিত জনগণের সামগ্রিক বিকাশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁরা আশা করেছিলেন, একেবারে নীচুতলা পর্যন্ত এই দলিত মানুষদের নিদারুণ গরিবি দূর করে মূল প্রবাহে তাদের তুলে আনতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ১০ বছরের জন্য রাখলেই কাজ হবে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম এক্ষেত্রেও ঘটেছে। পশ্চাদ্‌পদতা ও গরিবি দূর হওয়ার বদলে, ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী শোষণে অন্যান্য শোষিত জনগণের সাথে দলিত সম্প্রদায়ের জনগণের জীবনও আরও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মানের ক্রমাগত অবনতি হয়েছে। পুঁজিবাদের নিয়ম অনুযায়ী দেশে শ্রেণীবিভেদ আরও তীব্র হয়েছে, ধনী ও গরিবের ব্যবধান আরও বেড়েছে। সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও এর থেকে কোন রেহাই পাওয়া যায়নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এমনই ঘটতে বাধ্য। তবে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা আর একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে। এর সুযোগ নিয়ে দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যেকার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, বড় জোর ২/৩ শতাংশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সংরক্ষণের যতটুকু সুযোগ সুবিধা, তা এরাই কব্জা করেছে। এর দ্বারা দলিতদের মধ্যে একটা 'ননী-খাওয়া' (cream layer) গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। ফলে, পুঁজিবাদী শোষণে নির্যাতিত দলিত জনগণের জীবনে তথাকথিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিষ্ঠুর পরিহাস রূপেই দেখা দিয়েছে। দলিত হোক বা অন্য যেকোন অংশের জনগণই হোক, এখন যদি তাদের জন্য নতুনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়, তাতেও পরিস্থিতির বদল কিছু হবে না। সুবিধাভোগী অংশ ক্ষীরটুকু দখল করবে, বাকি বিরাট অংশের জনগণ আগের মতই ধুঁকতে থাকবে। গরিষ্ঠ অংশের অসহায় জনগণ সংরক্ষণের বুলিতে আকৃষ্ট হয়ে ক্ষমতালোভী ধূর্ত রাজনীতিকদের হাতে দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহৃত হবে।

'৮০-র দশকের শেষ দিকে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করার কথা ঘোষণা করায়, ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে, চাকরি পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর নিরীহ যুবকদের রক্তে রাজপথ ভিজেছিল। পশ্চাদ্‌পদ হিসেবে যারা চিহ্নিত ছিল তাদের জন্য সংরক্ষণের মাত্রা ২২.৫ থেকে লাফ দিয়ে ৭০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তফশিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়াও অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ অংশকে (OBC) তালিকাভুক্ত করা হল। কিন্তু এর ফলে তাদের অবস্থার কি কিছু উন্নতি হয়েছে? এই অংশের বেশিরভাগ মানুষই এখনও কৃষির উপরই নির্ভরশীল এবং এদের জীবনে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বেকারি ও অবহেলা সীমাহীন। এরা বাস্তবে অনাহারের পর্যায়েই রয়েছে। সংবাদপত্রেই খবর বেরিয়েছে, গরিব উপজাতি জনগণ বিষাক্ত আমের আঁটি বা ঐ জাতীয় কিছু খেয়ে হয় মারা যাচ্ছে, না হয় সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হচ্ছে। সরকারি হিসাবে এদের ৬৫ শতাংশই নিরক্ষর, বেসরকারি মতে ওটা ৯০ শতাংশ। তফশিলি জাতির ১০.৩ শতাংশ এবং উপজাতির ১১.৭ শতাংশের নিজস্ব জমি আছে, কিন্তু সেটাও এত সামান্য, যা দিয়ে সংসার চলে না। বাকি প্রায় ৯০ শতাংশের কোন জমি নেই। এরা ভূমিদাস হিসাবে মনুষ্যেতর জীবনযাপন করে। একটা হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৯৩-৯৪ সালে গ্রামীণ তফশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষের মধ্যে যথাক্রমে ৮৬.২৪ শতাংশ ও ৮২.২৭ শতাংশের কৃষি থেকে কোনও দৈনিক আয়ই ছিল না। এদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৩২৩৭ টাকা থেকে ৩৫০০ টাকার মধ্যে, অর্থাৎ দৈনিক ১০ টাকারও কম। এই হতদরিদ্র মানুষগুলির ৭০ শতাংশের

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ১৪ নভেম্বর, ২০০৩ ৫৬ বর্ষ / ১৩ সংখ্যা

বাধা ও হামলা সত্ত্বেও রাজ্যব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট সর্বাত্মক

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১০ নভেম্বর সর্বাত্মক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে দৃঢ় প্রতিবাদ জানাল রাজ্যের ছাত্রসমাজ। আর জি কর মেডিকেল কলেজে ৬ জন জুনিয়র ডাক্তারকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত ও সাসপেণ্ড করার প্রতিবাদে, বেহাল স্বাস্থ্যপরিষেবার উন্নয়ন ও মেডিকেল শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি বাতিলের এবং হাসপাতালে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে ১০ নভেম্বর এ আই ডি এস ও'র ডাকা ছাত্র ধর্মঘট রাজ্যের সর্বত্র সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়েছে। এস এফ আই ও স্থানীয় সি পি আই এমের লোকজন বাধা দিয়ে, এমনকি বহু স্কুল-কলেজে হামলা চালিয়েও ধর্মঘট ভাঙতে পারেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ সহ রাজ্যের সর্বত্রই ছাত্ররা এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। মেডিকেল কলেজগুলিতে ৬ই নভেম্বর একই দাবিতে মেডিকেল কলেজ স্টুডেণ্টস্ অ্যাকশন ফোরামের ডাকে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছিল, তাই এদিন এই কলেজগুলিকে ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়, তা সত্ত্বেও মেডিকেল ছাত্ররাও এদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধর্মঘটে সামিল হয়ে বুঝিয়ে দিল কেরিয়ারের ভয় দেখিয়ে তাদের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করা যাবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ভাঙতে এস এফ আই দুষ্কৃতীরা পিকেটিংরত ডি এস ও কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। পাঁচজন ডি এস ও কর্মী আহত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এস এফ আই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ভাঙতে পারেনি। হিন্দু, হেয়ার এবং সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ছাত্ররা এদিন ধর্মঘট পালন করেছে। মেদিনীপুর কলেজে এস এফ আই এবং পুলিশ যৌথভাবে ডি এস ও কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ১৮ জন ডি এস ও কর্মীকে। কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজে এস এফ আইয়ের আক্রমণে ডি এস ও কর্মী কমরেড পাঞ্চালী ভট্টশালী আহত হয়। জলপাইগুড়ি এ সি কলেজে এস এফ আই-এর আক্রমণে কমরেডস ঝর্ণা রায়, কবিতা রায়, স্বপন মণ্ডল আহত হয়েছে। কমরেড স্বপন মণ্ডলকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। জলপাইগুড়ি গভঃ গার্লস কলেজে ডি এস ও কর্মী কমরেড যশোদা বর্মন এস এফ আই-এর আক্রমণে আহত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ কে এন কলেজে ছাত্র পরিষদ ধর্মঘট ভেঙে কিছু ছাত্রকে ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল। কাকদ্বীপে স্থানীয় সি পি এম গুণ্ডবাহিনীর আক্রমণে ৮ জন ডি এস ও কর্মী আহত হয়েছে। কোচবিহারে জেলা সম্পাদক কমরেড গৌরাঙ্গ দেবনাথ সহ তিনজন ডি এস ও কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ধর্মঘটকে রাজ্যব্যাপী সর্বাত্মকরূপে সফল করার জন্য এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান ছাত্রসমাজকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন। ছাত্রসমাজের এই সম্মিলিত প্রতিবাদের পরও রাজ্য সরকার দাবি না মানলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচি নিয়ে ডি এস ও রাস্তায় নামছে।

এস এফ আই এবং পুলিশের যৌথভাবে ডি এস ও কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডি এস ও'র পক্ষ থেকে ১১ নভেম্বর রাজ্যব্যাপী ধিক্কার দিবস পালন করা হয়।

আমেরিকা, ফ্রান্স, সিরিয়া, তুরস্ক, কিউবা, আলজিরিয়া, মরিশাস, প্যালেস্টাইন, কঙ্গো, নেপাল, বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগ দেবেন

গদীর রাজনীতি সি পি এম-কে ক্রিমিনালভিত্তিক ও মিথ্যাসর্বস্ব দলে পরিণত করেছে

এস ইউ সি আই -এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন — "দলগাঁওয়ের ঘটনায় সি পি আই (এম) নেতৃত্ব ঘরে-বাইরে এত কোণঠাসা হয়েছে যে, তিন দিনের মধ্যেই তারা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রেখেছে। ৭ই নভেম্বর দলীয় মুখপত্রে তারা মাফিয়া লিডার তারকেশ্বরের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে তাকে সৎ, সমাজসেবী ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী দলীয় শ্রমিক নেতা বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে, আবার সবকিছু ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তীব্র ধিক্কারের মুখে পড়ে ৯ই নভেম্বর উল্টে বলেছে যে, তাদের দলের সাথে তারকেশ্বরের কোন সম্পর্কই নেই। আর এক মাফিয়া লিডার দুলালের ক্ষেত্রেও তারা একই রাস্তা নিয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি সি পি আই (এম) নেতৃত্ব গোয়েবলসীয় কায়দায় যতই মিথ্যাকে সত্য বানাবার চেষ্টা করুক, জনগণ তাতে বিভ্রান্ত হবেন না।

গদীসর্বস্ব রাজনীতি সি পি আই (এম)কে আজ কিভাবে ক্রিমিন্যালভিত্তিক এবং মিথ্যা সর্বস্বে পরিণত করেছে, এ ঘটনা পুনরায় তা দেখিয়ে দিল।

আমরা জনগণকে এবং বিশেষভাবে সি পি আই (এম)-এর সৎ কর্মী-সমর্থকদের এই দুষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

যেসব নেতার আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে তারকেশ্বরের সন্ত্রাসবাহিনী গড়ে উঠেছিল তাদের এবং তারকেশ্বরের কঠোর শাস্তি দাবি করছি।"

সংরক্ষণ ঃ ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন

সাতের পাতার পর

বাসস্থান বলতে ভাঙাচোরা মাটির কুঁড়ে ছাড়া কিছু নেই — যে ঘরও আবার বর্ষাকালে ভেঙে পড়ে এদের নিরাশ্রয় করে দেয়। এদের ৭৩ শতাংশ ভাল জল পায়না, ৯৪.৬৫ শতাংশের জীবনে বিদ্যুৎ ব্যবহারের কোন সুযোগই নেই।

অতএব, একথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার, যে অংশের সাধারণ মানুষের জীবনে উন্নতি ঘটাবার কথা বলে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছিল, তারা বাস্তবে কোনও সুফলই পায়নি। একথাও পরিষ্কার যে, সংরক্ষণের সুবিধা দরিদ্র মানুষদের পেতে হলেও অর্থনীতির অবস্থা এমন হতে হবে, যাতে তা মানুষকে চাকরি দিতে পারে। ভারতের অর্থনীতির অবস্থা আদপেই তেমন নয়।

অর্থনীতির এই বাস্তব অবস্থা শাসক দলগুলোরও খুব ভালই জানা আছে। তবুও সরকারি দলগুলো, এবং যারা কখনও বিরোধী আসনে থাকলেও সরকারি গদি দখলের প্রতিযোগী, তারা সকলেই কেন বারবার সংরক্ষণের ধুয়া তোলে? কেন বিশেষ অংশের মানুষের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের দাবি জানায়? কেন সরকারে থাকলে সংরক্ষণের কোটাও বাড়িয়ে যায়?

আসলে এইসব সরকারি দলগুলো বুর্জোয়া দল। সরকারে বা বিরোধী আসনে থেকে এরা বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থেরই সেবা করে। যেজন্য এরা কোনদিনই জনগণের সামনে এ সত্য বলেনা যে, দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও চাকরির সঙ্কটের জন্য দায়ী হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণী, বুর্জোয়া উৎপাদন ও শাসন ব্যবস্থা। এই মূল কারণকে আড়াল করে তারা এমনভাবে সমস্যাকে দেখায়, যেন বিশেষ বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যই অন্য বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। এর দ্বারা মূলত তারা তিনটি মতলব হাসিল করার চেষ্টা চালায় ঃ

(১) বিশেষ একটা সময়ে যে বিশেষ অংশের মানুষের জন্য তারা সংরক্ষণের দাবি তোলে তাদের মধ্যে নিজস্ব দলীয় ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা,

(২) চাকরির সঙ্কটের জন্য কোনও একটি বিশেষ ধর্ম-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষ দায়ী এ ধারণা সৃষ্টি করে শোষিত মানুষ শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঁচার লড়াইয়ে যাতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়াতে না পারে, তার জন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, সন্দেহ সৃষ্টি করে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় তাদের ফাঁসিয়ে দিয়ে তাদের ঐক্য ভেঙে দেওয়া এবং পুঁজিবাদী শাসনকে দীর্ঘায়িত করা,

৩) যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সব সঙ্কটের মূল কারণ তাকেই মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা।

এই পরিস্থিতিতে 'বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বেকারদের কাজ দিতে হবে' এই দাবি তোলাই হচ্ছে শোষিত মানুষের দায়িত্ব।

এই পরিস্থিতিতে, ভারতের শাসক শক্তি বিশ্বায়নের নামে কলকারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক ছাঁটাই করার যে নীতি নিয়ে চলছে, তা পাল্টাতে তাদের বাধ্য করাই হচ্ছে বর্তমানের জরুরি প্রয়োজন। সরকারি, আধাসরকারি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলিতে কর্মীসংকোচনের নীতি থেকে সরকারকে সরে আসতে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সরকারকে আরও শিল্প স্থাপনে বাধ্য করতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপই একমাত্র সরকারকে এই কাজে বাধ্য করতে পারে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যই মেহনতি জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের সেবাদাস সরকার কোনভাবেই দলিত ও অ-দলিতদের মধ্যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে কোনরকম বিভেদ, কোনরকম ফাটল ধরাতে না পারে। এ ধরনের সরকারি চক্রান্ত জনগণকেই রুখে দিতে হবে। এ ধরনের আন্দোলন যদি গড়ে তোলা যায়, যার সম্ভাবনাও বাস্তবে যথেষ্ট রয়েছে, তবেই সরকারি ও আধা সরকারি ক্ষেত্রে চাকরির উপর নিষেধাজ্ঞা হটিয়ে কিছু চাকরির সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। তাহলেই একমাত্র দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পেতে পারে। একমাত্র তখনই অবস্থার অন্তত কিছু উন্নতি আশা করা যেতে পারে। দলিত এবং অন্যান্য সকল অত্যাচারিত বঞ্চিত জনগণকে তাদের সংহতি বজায় রাখতে এবং দেশব্যাপী শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে বেশি দরকার।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net